

দশম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ১৯৭২-১৯৭৫

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের মধ্যেই মুজিবনগর প্রশাসনের সিনিয়র আমলাবৃন্দ (সচিব রঞ্জল কুন্দুসের নেতৃত্বে) ঢাকায় এসে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন। ২২ ডিসেম্বর মুজিবনগর সরকারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় আসেন। ঢাকায় পৌছে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ‘তিনি খোন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করে আবুস সামাদ আজাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন’ (তবে খোন্দকার মোশতাক আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বহাল থাকেন)। এমনি প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং লভন ও দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কারাগারে আটক থাকলেও তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবগরে ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তাহলো ১১.০১.৭২ তারিখে ‘অস্থায়ী সংবিধান আদেশ’ জারির মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। বঙ্গবন্ধুর আজন্মালিত স্বপ্ন ছিল একটি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সেই লক্ষ্যে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারির পর ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির কাছে প্রথমে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবেই ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনামল বা ‘বঙ্গবন্ধুর শাসনামল’। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে ঐ শাসনামলের অবসান ঘটে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামল মাত্র ৩ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন স্থায়ী ছিল।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় যুদ্ধবিধবন্ত বাংলাদেশের চিত্র
বঙ্গবন্ধু যখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন সেসময় এই দেশটি নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তান বাহিনীর জ্বালাও পোড়াও নীতির ফলে হয়ে পড়েছিল এক যুদ্ধ-বিধবন্ত ভূখণ্ড। এর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে

পড়েছিল। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানা সবকিছুই তখন ছিল বন্ধ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি ছিল নামে মাত্র। সারা দেশে ডাক বিভাগ ছিল বন্ধ, তার বিভাগ হয়ে পড়েছিল অচল, অসংখ্য কালভার্ট-ব্রীজ-সেতু ধ্বংসপ্রাণ হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বিধবস্ত। মাইন পোতার কারণে নৌবন্দরগুলি ছিল অচল। ব্যাংকগুলি ছিল বন্ধ এবং তহবিল শূন্য। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রিপোর্টে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে :

Bangladesh inherited a poor, undiversified economy, characterised by an under-developed infra-structure, stagnant agriculture, and a rapidly growing population. She had suffered from years of colonial exploitation and missed opportunities with debilitating effects on initiative and enterprise. Superimposed on all these were the effects of the war of liberation, which caused serious damage to physical infrastructure, dislocation in managerial and organisational apparatus and disruption in established external trading partnership.

যুক্ত-বিধবস্ত বাংলাদেশের খাতওয়ারি ক্ষয়-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

(১) কৃষি ক্ষেত্রে

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খাদ্য শস্য উৎপাদন এমনিতেই বিস্থিত হয়েছিল, উপরন্তু পাকিস্তান বাহিনী পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে সরকারি গুদামে মণজুদ খাদ্যশস্য, শস্যবীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ এবং মাঠের গভীর ও অগভীর নলকূপ ধ্বংস করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে আয় উপার্জন ব্যাহত হওয়ায় কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করে আবাদ করার টাকা-পয়সা কষকের হাতে ছিল না। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনী ও রাজাকার-দালালরা কয়েক লক্ষ হালের বলদ ও গাভী জবেহ করে গোশত খেয়েছে। ফলে হাল চাষের জন্য গবাদি পশুর সংকট দেখা দেয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি ঝণ প্রদান, বীজ সংগ্রহ করা, গভীর ও অগভীর নলকূপ মেরামত বা পূর্ণখনন করা, কয়েক লক্ষ গরু আমদানি করা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উন্নত পরিস্থিতিতে কৃষি পুনর্বাসন কাজ ছিল এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তান আমলে ভূমি উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রমের কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ১৯৭১ সালে ৭৪% আবাদি জমি ছিল এক ফসলি এবং মাত্র ২৬% জমি ছিল দো-ফসলি ও তিন ফসলি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের ব্যবস্থাও ছিল সামান্য।

(২) খাদ্য সংকট

বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভাব গ্রহণের সময় দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকার মাত্র ৪ লাখ টন খাদ্য শস্য মজুদ পান। এমনি সংকটময় পরিস্থিতিতেও সরকারকে প্রায় নববই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, আটককৃত ৫০-৬০ হাজার রাজাকার ও দালাল এবং প্রায় সোয়া-লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহের এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

(৩) ধর্মস্থান সরকারি-বেসরকারি ভবন ও প্রয়োজন ভবন

পাকিস্তানী বাহিনী সারা বাংলাদেশে প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাইমারি স্কুল, ৬ হাজার হাই স্কুল ও মাদ্রাসা, ৯ শত কলেজ ভবন ও ১৯ হাজার গ্রাম্য হাট-বাজার পুড়িয়ে দেয়। এগুলো নতুন করে নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর পরিমাণ অর্থের এবং নির্মাণ সামগ্রী যেমন বাঁশ, কাঠ, টিন ইত্যাদি। উপরন্ত মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি শরণার্থী ও দেশের অভ্যন্তরে উদ্বান্ত হওয়া লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন করার এক কঠিন দায়িত্ব এসে যায় সরকারের সামনে।

(৪) বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম

মুক্তিযুদ্ধের সময় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যত বন্ধ ছিল। সে সময় পুড়িয়ে দেয়া শিক্ষাভবনগুলো পুনর্নির্মাণ এবং ধর্মস্থান আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি মেরামত বা নতুন করে নির্মাণ করে ক্লাশ শুরু করা নতুন সরকারের জন্য ছিল এক বড় দায়িত্ব। তাছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী পাঠ্য বই রচনা ও প্রকাশের এক শুরু দায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য শিক্ষক শহীদ হওয়ায় সে পদগুলো পূরণের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকদের ৯ মাসের বেতন বন্ধ ছিল। তা পরিশোধ করাও ছিল এক শুরু দায়িত্ব।

(৫) বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে ২৭৪টি ছোট বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেল সেতু ধর্মস্থান হয়। সে সময় ৪৫ মাইল রেল লাইনের সম্পূর্ণ অংশ এবং ১৩০ মাইল রেল লাইনের আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৫০টি বগি ও বেশ কয়েকটি রেল ইঞ্জিন অকেজো হয়। রেল ইঞ্জিন ও বগি মেরামতের কারখানাগুলো সম্পূর্ণ ধর্মস করা হয়। সরকারি পরিবহনের শত শত বাস ও ট্রাক ধর্মস্থান হয়। ধর্মস্থান বেসরকারি বাস ও ট্রাকের সংখ্যা বেহিসেবি। সারা দেশে প্রায় ৩০০০ মালবাহী লৌকা ভুবিয়ে দেয়া হয়। দেশের শতকরা ৮৫টি জলযান ধর্মস হয়। মাল পরিবহনের সরকারি কার্গোগুলোও নিমজ্জিত হয়। চট্টগ্রাম ও ঢালনা বন্দরে মাইন পোতার কারণে বন্দর দুটি অকার্যকর হয়েছিল। দেশের বিমান বন্দরসমূহের রানওয়ের ক্ষতি সাধন করা হয়। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বেসামরিক যাত্রীবাহী কোন বিমান সরকারের হাতে ছিল না।

(৬) বিধ্বস্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলা শহরসহ বিদেশের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা ধর্মস হয়। আত্মসমর্পণের পূর্বে টেলিফোন এক্সচেঞ্চ ভবনগুলোতে পাহারারত পাকিস্তান বাহিনী ট্রাকব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেয়। তারা টেলিফোন সংস্থার নথিপত্র পুড়িয়ে দেয়। টেলিফোন ব্যবস্থা সচল করার জন্য তাঙ্কশিকভাবে প্রয়োজন ছিল ঢাকা শহরের জন্য কমপক্ষে ৫০০০ টেলিফোন সেট, ৩১টি ট্রাক লাইন নতুন করে স্থাপন, এক্সচেঞ্চের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা, ২০০০ কিমি দীর্ঘ টেলিফোন তার আমদানি করা, কমপক্ষে ১০০০ দক্ষ টেলিফোন কর্মী ইত্যাদি।

(৭) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

সারা দেশে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাণ হয়েছিল। অনেকস্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোড়াউনগুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার কিছুই মজুদ ছিল না।

(৮) অর্থনৈতিক অবস্থা

আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত কাগজের নেটওয়েল পুড়িয়ে দেয় এবং গচ্ছিত সোনা লুট করে। উপরন্ত ব্যাংকের নথিপত্রও তারা বিনষ্ট করে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অংশের ব্যাংকগুলোতে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৬০% এবং নিম্নস্তরের কর্মচারীদের ২০% ছিল অবাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের পর অবাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মস্থলে অনুপস্থিত হলে ব্যাংকগুলোতে দক্ষ জনবলের অভাব দেখা দেয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় শিল্প-কল-কারখানাগুলো প্রায় বক্ষ ছিল। ফলে অনেক মিল অকেজো হয়ে পড়ে। এগুলো চালু করার মত স্পেয়ারপার্টস ও কাঁচামাল কোন গুদামেই মজুদ ছিল না। উপরন্ত বিভিন্ন মিলে কর্মরত অবাঙালি শ্রমিকেরা আত্মগোপনে বা রিফুজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়ায় দক্ষ শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। কাঁচামাল আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়।

(৯) বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামো ও দক্ষ প্রশাসকের অভাব

দেশ পুনর্গঠনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন ছিল দক্ষ প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, ব্যাংকার এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের। ডাক, তার, রেল, মিল-কল-কারখানা প্রত্তি সেক্টরে অভিজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান আমলে অবাঙালিরা এসব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতো বিধায় নতুন রাষ্ট্রে দক্ষ কর্মীর অভাব দেখা দেয়।

(১০) সংবিধান ও আইনের শূন্যতা

নতুন সরকারের হাতে কোন সংবিধান ছিল না। ছিল উপনিবেশিক আইন ব্যবস্থা। স্বল্প সময়ে সংবিধান প্রণয়ন ও যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর সরকারকে পালন করতে হয়।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা ছাড়াও নতুন সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে আরও যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

- (ক) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অন্তর্ন উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করা। শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করাও ছিল বঙ্গবন্ধুর সামনে অন্যতম গুরু দায়িত্ব;
- (খ) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দালালদের আটক করে বিচারের সম্মুখীন করা;
- (গ) পাকিস্তানে আটক প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনা;
- (ঘ) বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রায় সোয়া লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো;
- (ঙ) স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ করা;
- (চ) জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন করা;
- (ছ) যুক্তিবিধবস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অনুদান লাভ করা;

- (জ) বিরোধী রাজনীতিকে মোকাবিলা করা। সেমন্তব্য আন্দোলন-সংগঠনের প্রতিক্রিয়া করা। এসব বঙ্গবন্ধুর সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল;
- (ঝ) সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা;
- (ঞ) আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব, বাংলাদেশকে ঘিরে সৃষ্টি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের বড়যত্ন ইত্যাদি মোকাবিলা করা। এসব বঙ্গবন্ধুর সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়;
- (ট) সর্বোপরি, দেশের জনগণের আকাশচূম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা, ঐতিহাসিক ১১ দফায় উল্লেখিত দাবিগুলো—যেমন, ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের উপর থেকে খাজনা হ্রাস করা, বকেয়া খাজনা মওকুফ করা, ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।

বঙ্গবন্ধুর সরকার যুদ্ধবিধবস্ত বাংলাদেশ গঠনের কঠিন চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক নীতি ও পরিকল্পনার ভিত্তি এবং পূর্ব প্রস্তুতি

বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘকাল আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। সুতরাং সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সময় তাঁর সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পূর্ব পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ তাঁর আজন্মালিত সোনার বাংলা গঠনের জন্য, কিংবা যুদ্ধবিধবস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন করে দেশবাসীর আকাশচূম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি কি ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করবেন, কিভাবে তিনি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার সাধন করবেন সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কোন কর্মপরিকল্পনা, কিংবা তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কোন ম্যানিফেস্টো ছিল না বলে অপপ্রচার করা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, বঙ্গবন্ধুর সরকার যে ব্যাপক জাতীয়করণ নীতি অবলম্বন করেন তা তিনি করেছিলেন বামপন্থীদের চাপে কিংবা সোভিয়েট প্রভাবে। আওয়ামী লীগের শ্রেণী চরিত্র ও আওয়ামী লীগ নেতাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে বঙ্গবন্ধুর সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণের বিষয়টি মেলে না বলেই অমন ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি পাকিস্তান আমলের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি, সতরের নির্বাচনের সময় ঘোষিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এবং মুজিবনগর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করি তাহলে এটা সুস্পষ্ট করে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপরিচালনার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আদর্শিক ভিত্তি ও দর্শন বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল। কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন:

- (১) ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুজ্বলন্ট যে ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল তার ১২নং

- (২) ৬ দফার অনুসরণে প্রশ্নীত ১১ দফা দাবিতে ব্যাংক, বীমা ও সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার মত অর্থনৈতিক দাবি অর্জন্তু করা হয়েছিল। তাছাড়া চাষীদের জন্য করহাস, কিংবা শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও বোনাসের দাবিও ১১ দফাতে ছিল। আওয়ামী লীগ সম্পরের নির্বাচনে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি গণরায় লাভ করে;
- (৩) ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'মানুষে মানুষে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবিচার দূরীভূত করার' লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, পাট ও তুলা বাণিজ্য, শিপিংসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের বিষয়টি পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্থির করা হবে'। এছাড়াও ইশতেহারে ২৫ বিধা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।
- (৪) প্রবাসী সরকার গঠনের পর দশ এপ্রিল ৯.৩০ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র শিলিঙ্গড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য নিম্নরূপভাবে স্থির করেন: বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রাচিত হোক এই নতুন পৃথিবী, যেখানে মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক কৃধা, রোগ, বেকারত্ব আর অঙ্গনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক সাড়ে সাত কোটি বীর বাঙালি ভাই-বোনের সম্মিলিত মনোবল, অসীম শক্তি। যাঁরা আজ রজ্জ দিয়ে উর্বর করেছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন মানুষ। তাঁদের রজ্জ আর ঘামে ভেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা; গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক 'জয় বাংলা', 'জয় স্বাধীন বাংলাদেশ'।
- (৫) বাংলাদেশ স্বাধীন করার পিছনে বঙ্গবন্ধুর যেমন একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছিল, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠন করার জন্যও বঙ্গবন্ধুর মনে যেন একটা কর্ম কৌশল তৈরি করারই ছিল—তা তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন (১০.১.৭২) থেকে পরবর্তী ২/৩ দিন প্রদত্ত বক্তব্য বিবৃতি থেকে অনুধাবন করা যায়। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে এমনিভাবে আটক ছিলেন যে তখন তিনি গোটা বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) মুক্তি পেয়ে লক্ষন-দিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারি ঢাকা পৌছা পর্যন্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়নি, অথচ ঢাকা পৌছেই তিনি যে বক্তব্য দিলেন তাতে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করলেন যেন সেগুলো তিনি পূর্ব থেকেই মনের কোণে রচনা করে রেখেছিলেন।
- প্রথমেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অঙ্গুলি রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন :
গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম, 'দুর্গ গড়ে তোল', আজ আবার

বলছি, 'আপনারা একতা বজায় রাখুন' আমি বাংলাদেশকে সুজি করে ছাড়ব'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত স্বাধীন।' একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেব না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশকে পেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোন ব্যক্তি নাই।

বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনী ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) তিনি বলেন,

আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই দেশে ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা প্রশ্নে তিনি আরও বলেন:

এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হ্রণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না।

যুদ্ধাপরাধী-দালালদের বিচার প্রসঙ্গে বাংলার মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু সেদিন দৃঢ়কর্ত্তে উচ্চারণ করেছিলেন:

গত ২৫শে মার্চ থেকে এ পর্যন্তদীর্ঘ ৯ মাসে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বৃক্ষজীবীকে হত্যা করেছে। তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এসব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জগন্যতম কৃকৃতির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করে বর্বর পাক বাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

এ দেশীয় দালালদের প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন:

ইয়াহিয়া সরকারের সাথে যারা সত্ত্বিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।

দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :

আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

দেশের স্বাধীনতা অর্থবহু করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন :

বাংলাদেশকে একটি সুবী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এভাবে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি (১৯৭২) ঢাকা পৌছে লাখ লাখ জনতার যে প্রাণচালা অভিনন্দন পান তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি তাৎক্ষণিকভাবে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন তাতে নতুন সরকারের করণীয় অনেক বিষয়েরই উল্লেখ ছিল। এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৪ জানুয়ারি তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তৃতা দেন তাতে তাঁর সরকারের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধা বিষয়ে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ছিল।

তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে তিনি বলেন :

সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাই তাঁহার চূড়ান্ত লক্ষ্য। বর্তমান মুহূর্তে পুনর্বাসন ও জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনই সবচেয়ে জরুরী কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিনি সমগ্র বিশ্বের সাহায্য কামনা করেন এবং এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আমরা যেকোন দেশেরই সাহায্য ই গ্রহণ করতে প্রস্তুত-তবে সেই সাহায্য হবে শতাধীন।

অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ ও গতিশীল করা বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন :

অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ ও গতিশীল করাই সবচাইতে জরুরী কর্তব্য। অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করিয়া তুলিতে হইবে। খাদ্য, আশ্রয় ও পরিধানের বক্ষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় চালু করা হইবে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ গড়িয়া তোলা হইবে। জরুরী ভিত্তিতে সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

সংবাদ সম্মেলনে ‘মুজিববাদ’ সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে বঙবন্ধু বলেন :

‘আমি এখন বলিতে পারিব না’।

সংবাদ সম্মেলনে বঙবন্ধু বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসাবে গঠন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে,

আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। আমাদের নীতি হইতেছে সকলের সহিত বন্ধুত্ব। কাহারো সহিত বিদেশ পরায়ণতা নয়। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হইবে জোট নিরপেক্ষ।

বাংলাদেশ ভারতের প্রভাবিত একটি রাষ্ট্র কি-না সে বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উভয়ে বঙবন্ধু বলেন,

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

এভাবে বঙবন্ধু বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র এক সন্তানের মধ্যেই তাঁর সরকারের কর্মপরিকল্পনা জাতির সামনে তুলে ধরেন। যেমন :

- (১) ১৪ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করেন, ‘দেশের মুক্তির জন্য যে-সকল যুবক সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাদের সমাজে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে’,
- (২) ১৬ জানুয়ারি (১৯৭২) সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রাক্কালে (১৫ জানুয়ারি) তিনি ঘোষণা করেন যে, ‘মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার যেসব কৃতী সন্তান শহীদ হইয়াছেন তাঁহাদের স্মরণে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হইবে’
- (৩) ১৭ জানুয়ারি এক সরকারি হ্যান্ড আউটের মাধ্যমে বঙবন্ধু ১০ দিনের মধ্যে সকল অন্ত জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন;

অতএব, উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শাসনভাবে গ্রহণ করার সময় বঙবন্ধু সরকার তাঁর কর্তব্য-কর্ম বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। বঙবন্ধুর কাছে এটা

স্পষ্ট ছিল যে যুক্ত-বিধবস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে অসাধ্যকার ভঙ্গে তার কাজ করতে হবে এবং কত দ্রুততার সাথে তা করতে হবে। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা, ১৯৫৪ সালের ২১ দফা, ঐতিহাসিক ৬ ও ১১ দফা, সমরের নির্বাচনী ইশতেহার, স্বাধীনতা সনদ-ইত্যাদি ছিল তার রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি নির্ধারণের সহায়ক।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা

মন্ত্রী পরিষদ : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধান বিচারপতির নিকট দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি (১৯৭২)। ঐ সভায় কতকগুলো মৌলিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন :

- (১) ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে প্রচলিত বাংলাদেশের পতাকার নকশা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র তুলে সবুজের মাঝখানে শুধু লাল গোলক রেখে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অনুমোদন করা হয়।
- (২) বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ নির্ধারণ করা হয়।
- (৩) বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ‘চল চল চল উর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল’ গানটি বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাড়ে তিন বছরের কর্মকাণ্ড বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করব।

ক. সংবিধান প্রণয়ন

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে মৌলিক আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। ‘এই সনদ ছিলো আইনের মূল সূত্কাগার এবং সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিলো দেশের সংবিধান’। এই সনদে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির বিধান করা হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। উক্ত ক্ষমতাবলে বঙ্গবন্ধু ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পরের দিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) ‘অস্থায়ী সংবিধান আদেশ’ জারি করেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল জনগণকে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় প্রতিশ্রূতির বাস্তবায়ন। ১৯৪৯ সালে জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ ছিল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রূতিবদ্ধ। ১৯৫৪ সালের ২১ দফায়, ৬ ও ১১ দফায় এবং ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদীয় পদ্ধতির দাবী করেছে।

‘অস্থায়ী সংবিধান আদেশ’ বলে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পদক্ষেপ পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। একাকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ ‘গণপরিষদ আদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্যপদ বাতিল) আদেশ’ নামক ২টি আদেশ জারি করে। প্রথমটির মাধ্যমে ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। আইনসভা হিসেবে কাজ করার কোন ক্ষমতা গণপরিষদের ছিল না। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী গণপরিষদের কোন সদস্য তার রাজনৈতিক দল (অর্থাৎ যে দলের মনোনয়ন পেয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন) থেকে পদত্যাগ করেন, কিংবা উক্ত দল থেকে বহিষ্কৃত হন তাহলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

এ দুটি আদেশ জারির পরপরই সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি কর্তৃক গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহকারী নেতা নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদউল্লাহ বিনা প্রতিষ্ঠিতায় গণপরিষদের যথাক্রমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এই কমিটিতে একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সুরজিত সেনগুপ্ত। কমিটিতে একজন মহিলা গণপরিষদ সদস্য (মোট মহিলা সদস্যসংখ্যা ছিল ৭ জন) অঙ্গভূক্ত করা হয়। কমিটিতে পরবর্তী ১০ জুনের (১৯৭২) মধ্যে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া উপস্থাপন করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কমিটি অত্যন্ত দ্রুত সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করে। ১৭ এপ্রিল কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে সংবিধান বিষয়ে প্রশ্নাব আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির ঘোষিত শেষ তারিখের (৮ মে ১৯৭২) মধ্যে কমিটি ৯৮টি সুপারিশমালা লাভ করে। পূর্বনির্ধারিত ১০ জুনের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। সংবিধানটিকে পূর্ণাঙ্গ ও উক্তম করার উদ্দেশ্যে কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও ইংল্যান্ড সফর করে সেখানকার পার্লামেন্টের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন। তাছাড়া সংবিধানটিকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কমিটি একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে। সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে ৯ অক্টোবর তা আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে উপস্থাপিত ও আলোচিত হয়েছিল। এভাবে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াটি কমিটির সভাপতি এবং দেশের আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সংবিধানের বিলের আকারে

গণপরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। ১৭ অক্টোবর গণপরিষদ সংবিধান বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর তা সমাপ্ত হয়। ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবিধানের বিষয়ে তার পার্টির সুপারিশ উপস্থাপন করেন। ৩১ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ধারাওয়ারি আলোচনা শুরু হয়। ৩ নভেম্বর পর্যন্তসে আলোচনা চলে। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত কতিপয় সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের ৭৩নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সুরক্ষিত সেন্টগুপ্ত কর্তৃক আনীত একটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান বিল পাশ হয়। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭২) স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও গণপরিষদ সদস্যগণ সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি কপিতে স্বাক্ষর দান করেন। তবে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরক্ষিত সেন্টগুপ্ত সংবিধান বইতে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে সংবিধানটি কার্যকর করা হয়। এরপর গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ মৃত্যুবরণ করায় (১২ অক্টোবর ১৯৭২) ইতোমধ্যে মোহাম্মদউল্লাহকে স্পিকার ও বায়তুল্লাহকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়েছিল। গণপরিষদ ভেঙে দেয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, বিধিবন্ধ সংবিধানের আওতায় দেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংবিধান প্রণয়নকালীন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও দলের প্রতিক্রিয়া ও মতামত সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠনের ঘোষণা দেওয়ার পর সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাদের মুক্তি ছিল যে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আইন শাসন কাঠামো' আদেশবলে। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসন কাঠামোর মধ্যে ৬ দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তর ঘটার সাথে সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ঐ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। সুতরাং তারা দাবি করেন যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করতে হলে একটি নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করতে হবে। এই দাবি নিয়ে ন্যাপ (ভাসানী) দলের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একটি সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৭২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এক জনসভায় তিনি সরকারের পদত্যাগ ও একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু সে সময় শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা তুসে থাকায় মওলানা

ভাসানীর আহ্বানে তেমন জনসমর্থন পাওয়া যায়নি।

সংবিধান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া

গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে কোন জোরালো বিক্ষোভ বা আন্দোলন গড়ে উঠেনি। কোন রাজনৈতিক দলই সংবিধানে অর্তভূক্ত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেনি বা সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকল্প কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দল (জাসদ) এই সংবিধানকে একটি 'বাজে সংবিধান' হিসেবে অভিহিত করে। এই দলের মতে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপর নানা বাধা নিষেধ আরোপ করে দেশে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার কোন দিক নির্দেশনা সংবিধানে দেয়া হয়নি। তবে দলটি এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করে যে দেশে কোন সংবিধান না থাকার চেয়ে একটি বাজে সংবিধান থাকাও শ্রেয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফফর) সংবিধানের কিছু কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করলেও সংবিধানকে স্বাগত জানায়। সেসময় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ থাকায় কিংবা আভারগ্যাউন্ডে থাকায় সংবিধান বিষয়ে খোলাখুলি কোন মন্তব্য বা সুপারিশ পেশ করতে পারেনি।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি

১৯৭২ সালের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এই সংবিধানে সংযোজন করা হয় একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ ও ৪টি তফসিল। এর প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠি ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্মকমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন ও একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ৪টি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এর মূল লক্ষ্য ছিল:

এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

সংবিধানে বাংলাভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে দেশের নাগরিকদের বাঙালি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এই সংবিধানে উল্লিখিত সমাজতন্ত্র যে উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল তা হচ্ছে: 'মানুষের উপর মানুষের শোষণবিহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা' (অনুচ্ছেদ ১০)। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয় যে, 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক

মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। মানবসত্ত্বের অর্যদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে' (অনুচ্ছেদ ১১)। সংবিধানে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা, কোন বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান না করা, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা এবং বিশেষ ধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন না করা। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনগণের সব ধরনের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টকে সকল ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার রক্ষাকৰ্ত্তব্য করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করে। উক্ত সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে উপাধিসর্বন করে। সংবিধানে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং ৩০০ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ১৫ জন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে আইন সভা গঠনের বিধান করা হয়। আইন সভার নাম দেয়া হয় 'জাতীয় সংসদ'। ১৯৭২ সালে সংবিধানে মহিলা আসনগুলো ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এই সংবিধানে বিধিবন্ধ করা হয় যে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল আদেশের অধীনে কেউ যে কোন অপরাধের জন্য যে কোন মেয়াদের জন্য দণ্ডিত হন তাহলে তিনি সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন (৬৬ নং ধারা যা ১৯৭৮ সালে বিলুপ্ত করা হয়)। সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বলা হয় যে, 'মুক্ত ও স্বাধীন একটি বিচার বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে' 'সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ স্বাধীন অবস্থায় থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন' (অনুচ্ছেদ ৯৪ (৪))। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক, পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন, ন্যায়পাল নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে বিধান করা হয়।

১৯৭২-৭৫ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। সংবিধান বিষয়ে মানবদুন্দু আহমদের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

মাত্র এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য আওয়ামী লীগকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এটি ছিল একটি ব্যাপক, সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় উন্নত মানের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতা থাকলেও এই সংবিধান জনগণের তৎকালীন আশা আকাঙ্ক্ষা বহুলভাবে প্রতিফলিত করেছিলো। সুদীর্ঘ-কালীন সংগ্রামে আওয়ামী লীগ জাতির সামনে যে অসংখ্য প্রতিশ্রূতি তুলে ধরেছিলো, এই সংবিধানের মাধ্যমে সেগুলো এক বিরাট অংশের বাস্তু বায়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

সংবিধানের সংশোধনী

আওয়ামী লীগ শাসনামলে (১২.১.১৯৭২—১৪.৮.৭৫) ১৯৭২ সালের সংবিধানকে ৪ বার সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ১৫

জুলাই। যুক্তাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদে সংশোধনা আনা হয়। সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে নির্মলপত্তাবে ৪৭-ক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় :

এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী আপরাধ বা যুক্তাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশ্রদ্ধবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনী সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দ দান করিবার বিধান সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।'

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে জরুরি বিধানাবলি সংযোজিত হয়। সংবিধানে তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর। এটি বাংলাদেশের সীমানা সংশোধনী সংক্রান্ত। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে দিল্লীতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দু দেশের ভূমি সীমানা সংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাই কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় (অনুচ্ছেদ ২)। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের সবচেয়ে সমালোচিত বিষয়। সংশোধনীটি গৃহীত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। এই সংশোধনীতে সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ফলে মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয় সংসদ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মূল সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগের যে সকল ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে দেয়া হয়েছিল চতুর্থ সংশোধনীতে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগের জন্য একটি সুপ্রিম সংবিধানিক আদালত গঠনের বিধান করা হয়। তাছাড়া চতুর্থ সংশোধনীতে হাইকোর্ট কর্তৃক অন্তর্ভুক্তিকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির বিধানও প্রত্যাহার করা হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একক জাতীয় দল গঠনের ঘোষণা দেয়া এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করার বিধান প্রণীত হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ঘোষিকতা

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে মূল সংবিধানে কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন, রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে মন্ত্রীপরিষদ ও জাতীয় সংসদকে ক্ষমতাহীন করা, বিচার বিভাগের উপর রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি ইত্যাদিই ছিল চতুর্থ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু। ১৯৭২-এর সংবিধানের উল্লিখিত পরিবর্তনগুলো ছিল নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক প্রকৃতির। স্বত্বাবতই প্রশ্ন জাগে কেন এই পরিবর্তন?

জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হওয়ার অব্যাহত পরেই কলকাতা শেখ মুজিবুর রহমান ঐ পরিবর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা, শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়েছিল। দেশের বিরাজমান নৈরাজ্যকর অবস্থার অবসান ঘটানো, জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা ও সকল শোষণ-অবিচার নির্যাতন দূর করার জন্যই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদ চতুর্থ সংশোধনীর অপরিহার্যতা বিষয়ে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

১. ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া বিদ্যমান আমলাতাত্ত্বিক প্রশাসন পদ্ধতি। সবসময় তিনি প্রশাসনের সংক্ষারমূখী পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন;
২. ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুণহৃত্যা যা ইতিমধ্যেই সংসদের ৪ জন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিসহ দলের অসংখ্য নেতাকর্মীর প্রাণহানির কারণ হয়েছিল;
৩. গুণহৃত্যা, অর্থনৈতিক ব্যাপক ধ্বংসসাধন, ধ্বংসমূলক তৎপরতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দালালদের কথিত ভূমিকা;
৪. জাসদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গুণ বিপুরী সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং তাদের বিধবৎসী তৎপরতা;
৫. গোষ্ঠীবিশেষের হাতে আগ্নেয়ান্ত্রের অবস্থিতি এবং সরকারবিরোধী কাজে তা ব্যবহারের অব্যাহত প্রবণতা;
৬. দুর্যোগময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশে দুর্ভিক্ষের মরণাঘাত, খাদ্যাভাব এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা;
৭. শিক্ষিত শ্রেণীই ছিল দেশের সবচাইতে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং তারাই ছিল সমাজের মূল শোষক। জনগণের শ্রমলক্ষ অর্থে সুশিক্ষিত হয়েও তারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে সেই প্রাণ শিক্ষা ব্যবস্থাতে নিরামণভাবে উদাসীন ছিলেন, সর্বোপরি ব্যাঙ্গ দুনীতির সাথে দেশের দরিদ্র জনগণ জড়িত ছিলেন না অথচ তার মতে দেশের ৫০% জনগোষ্ঠী শিক্ষিত শ্রেণীই ছিলো সমস্ত দুনীতির ধারক ও বাহক;
৮. প্রশাসন, শিল্প এবং শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিশ্঳েষণা;
৯. বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা ছিলো উপনিবেশবাদী ধারার বাহক এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে তার সংক্ষারমূখী পরিবর্তন ছিলো অপরিহার্য;
১০. মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর অব্যাহত শোষণ; এবং
১১. চোরাচালান, অবৈধ মজুদদারি ও কালোবাজারির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

সমাজের বুকে বিদ্যমান এসব দুষ্ক্ষত নিরাময়ের জন্যই শেখ মুজিব প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা দিয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় শেখ মুজিব জনগণের ঐক্যবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করে তাঁর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’র

বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। অতএব বলা যায় যে, সময়ের বিচারে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীকে মুক্তিযুক্ত বলা যায়। কিন্তু এর পূরোপূরি বাস্তবায়ন ও ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বেই শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়। তাই চতুর্থ সংশোধনীর ফলাফল বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

আইন প্রণয়ন

বঙ্গবন্ধু সরকার বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকার গঠনের প্রথম এক বছরেই প্রায় দেড়শ আইন প্রণয়ন করে। উল্লেখযোগ্য আইনগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরণ আইন

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় নিশ্চিত হবার পর অসংখ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অবাঙালি মালিকগণ দেশ ত্যাগ করলে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দখল সংক্রান্ত এই আইনটি ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রণীত হয়। এটি ১৯৭২ সালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশ (APO-1) নামে পরিচিত। এই আইনের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ: ৮

- (১) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালকমণ্ডলী অথবা ব্যবস্থাপকবৃন্দ কিংবা তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করছেন কিংবা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য উপস্থিত নেই, সরকার সে সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন;
- (২) এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার এবং এগুলোর হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব সরকার মনোনীত ব্যবস্থাপকমণ্ডলী অথবা প্রশাসকদের হাতে কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকবে;
- (৩) ১৯৭২ সালের ২ৱা ফেব্রুয়ারি জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ১৬ নং-আদেশ (PO 16)-এর মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি শুধু দখল নয়, তার বিক্রয়ের অধিকারও সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়;
- (৪) পরিত্যক্ত সম্পত্তির কাছে কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাওনা থাকলে সে বিষয়ে সরকারের হিসাব চূড়ান্ত বলে গণ হবে;
- (৫) PO 16-এর মাধ্যমে সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর সম্পাদিত সম্পত্তির যেকোন ইজারা বা চুক্তি অযোগ্য বলে বিবেচিত করতে পারতেন;
- (৬) সরকারের হাতে কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখলিস্ত্র যাওয়ার পর আদালত এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে না;
- (৭) সরকার ভূলক্রমে কোন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে থাকলে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা PO 16 তে রাখা হয়।
- (৮) PO 16-এর মাধ্যমে ‘শুধুমাত্র পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপরই নয়, দেশের নাগরিকদের যে কোন সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারেও সরকারকে অন্য সাধারণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়’।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে ‘পাকিস্তানীরা ২৮৮.৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৭২৫টি শিল্প ইউনিট পরিত্যক্ত রেখে পালিয়ে যান’। এগুলো ছিল বাংলাদেশের আধুনিক

শিল্পসমূহের মোট অংশের ৪৭% এবং বেসরকারি বাতের মোট শিল্পের ৭১% এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক যেগুলো এ অঞ্চলের মোট ডিপোজিটের ৭০% নিয়ন্ত্রণ করতো'। APO I-এবং PO 16-এর মাধ্যমে সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলোর 'মালিকানা স্বত্ত্বে গ্রহণের মাধ্যমে সেগুলো লুটপাটের হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। আমলাতঙ্গের দুর্বলতার সুযোগে কিছু সম্পত্তি লুটপাট হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে মালিক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেবল অবাঙালি হওয়ার কারণে তার সম্পত্তি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সরকারি মালিকানায় বা ব্যক্তিগামী দখল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দালাল অধ্যাদেশ, ১৯৭২

একান্তরের মুক্তিযুক্তির সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দৃঢ়সহ নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট, গৃহে অগ্নিসংযোগ এবং অন্যান্য দুর্কর্মে সহযোগিতা করার জন্য রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সারাদেশে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল 'পিস কমিটি'-যার সদস্যরা 'দালাল' নামে পরিচিত। এদের বিচার করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'এতে বলা হয়, হাইকোর্টের কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কিংবা সমপর্যায়ের মনোনীত কোনও ব্যক্তির নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হবে, যার কাজ হবে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাত্কার গ্রহণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা'। এভাবেই দালালদের বিচারের উদ্যোগের সূচনা ঘটে।

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরেই ঘোষণা করেছিলেন: 'বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জগন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে।' '১৮ জানুয়ারী (১৯৭২) প্রথ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ক্রস্টকে (পরবর্তীতে স্যার) দেয়া এক সাক্ষাত্কারে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আলবদরদের বিচার প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'আমি সবসময় ক্ষমা এবং ভূলে যাওয়ায় বিশ্বাস করি। কিন্তু ক্ষমা করা এবং ভূলে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব, কারণ, এগুলো ঠাণ্ডা মাথার এবং পরিকল্পিত ধরনের হত্যা, আমার মানুষের উপর গণহত্যা। আপনি কি মনে করেন কোন মানুষ এগুলো মনে নিতে পারে? এই লোকগুলোকে শান্তি দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই'।

অতএব বলা যায়, দালালদের বিচার প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল। তাই শাসনভার গ্রহণের ২ সপ্তাহের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ২৪.১.১৯৭২ তারিখে জারি করেন 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২'। এই আদেশ জারির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে অধ্যাদেশের প্রস্তাবনায় নির্মলুপ কারণ ও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল :

কতিপয় ব্যক্তি অথবা কোন সংগঠন বিশেষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর দালালজন্মে গণহত্যা, নির্যাতন, নারী ও শিশু নির্ধন ও বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি ও সম্মান হরনের জন্য পাক বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। এ ধরনের ব্যক্তিরা তাদের ঘৃণ্য তৎপরতা দিয়ে বাংলাদেশে একটি সন্ত্রাসের

রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এবং মানবতার বিরক্তে তারা এমন জনগণ অপরাধ করেছেন যে, বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্ব বিবেকের কাছে তা জন্ম্যতম তৎপরতা হিসেবে পরিচিহ্নিত হয়েছে। সে জন্মই তাদের কার্যধারার যথাযথ এবং কার্যকর প্রতিবিধান এবং তাদের তৎপরতা অনুসারে আইনের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করা একটি অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

আইনে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করা হয় :

(১) যাঁরা বাংলাদেশে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীকে তাদের অবৈধ অবস্থানে সহায়তা, সমর্থন, সংরক্ষণ এবং জোরদার করণে সাহায্য করেছেন; (২) যাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি, আকার-ইঙ্গিত বা আচরণের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীকে যেকোনোভাবে বৈষম্যিক সহায়তা দিয়েছেন; (৩) যাঁরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের বিরক্তে যুক্তরত হয়েছেন অথবা যুক্তে রত হতে সহায়তা করেছেন; (৪) যাঁরা পাক-হানাদার বাহিনীর বিরক্তে সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত কিংবা ধৰ্মস করেছেন; এবং (৫) যাঁরা পাক হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে তাদের অবৈধ অবস্থান সুদৃঢ়করণে সহায়তা করতে গিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অপপ্রচার করেছেন কিংবা হানাদার বাহিনীর কোনো প্রতিনিধিদলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিচালিত উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

মূল আইনের অপরাধের সংখ্যা ৬০টি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের জুন মাসে প্রণীত সংশোধনীতে অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৯টি হিসেবে করা হয়। এই ৬৯টি অভিযোগের যে কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত যে কোনো ব্যক্তিকে ‘দালাল বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা হলে যে কোনো পুলিশ অফিসার কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি তাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারতেন’। এভাবে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ছয়মাস অন্তরীণ রাখা যেত। প্রয়োজনে এই সময়সীমা আরো বাড়ানো যেত। এই আইন প্রণয়নের পূর্বে দালাল সন্দেহে আটককৃত ব্যক্তিদেরকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়। প্রথমে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরে নির্দিষ্ট অপরাধের বিচার করার জন্য সেশন জজ বা অতিরিক্ত সেশন জজ, বা সহকারী সেশন জজ দ্বারা গঠিত এক সদস্যের বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। পরবর্তী কালে দালাল আইনের এক সংশোধনীবলে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। প্রাতিক্রিয়া দালালদের অনুপস্থিতিতেই বিচার পরিচালনার বিধান করা হয়। কোনো দালালের অপরাধ প্রমাণের জন্য আইনে (সংশোধনী ১০ (ক)) নিম্নরূপ বিধান করা হয়:

কোন ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট কিংবা রাসায়নিক পরীক্ষার অন্য কোনো রিপোর্ট পাওয়া না গেলে, কিংবা পুলিশের কাছে কোনো অভিযোগ দায়ের করা না হলে, কিংবা তা বিলম্বে করা হলে, অথবা মৃতদেহের কোনো খোঁজ পাওয়া না গেলেও, কোনো অপরাধ প্রমাণের অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হবে না। হানাদার বাহিনীকে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কোনো দলিল যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে আদালতে পেশ করা

হলে এবং এ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ উত্থাপন না করা হলে, সেসমস্ত দালাল প্রক্রিয়াগ্রস্ত করা হবে। বিশেষ করে: আল-বদর, আল-শামস বা রাজাকারবাহিনীর লোকদের বিচার করার সময়ে এ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হতো।

দালাল আইনের আওতায় সারাদেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। এই আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাজা ছিল মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে কমপক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড প্রদান। এ আইন সম্পর্কে মওদুদ আহমদের মূল্যায়ন নিম্নরূপ :

এই আইনের প্রতিটি বিধানই ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সেকারণে উচ্চতর আদালতগুলো অনেকগুলো ক্ষেত্রে দালাল আইনে গ্রেফতারকৃত ও অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে জামিন প্রদানে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনের মতামত হলো, আইনের ১৪ নং অনুচ্ছেদ বলে হাইকোর্ট দালাল আইনে অভিযুক্ত কাউকে জামিন প্রদান করতে পারে না, কারণ আইনে বর্ণিত বিধানগুলো ছিলো অত্যন্ত পরিকার এবং অ-বিতর্কিত।

দালাল আইনের প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া ও এ আইনের প্রভাব সম্পর্কে মওদুদ আহমদ লিখেছেন:

সারা জাতির এক উন্নেজনা মুহূর্তে দালাল আদেশ জারী করা হয়। প্রথম মুহূর্তে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই আইনকে স্বাগত জানায়। কারণ জনগণ স্বভাবতই দালালদের শাস্তি কামনা করেছিলেন। অন্যদিকে দালাল এবং অবাঙালিদের ন্যায় দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও এই আইন যথেষ্ট আশীর্বাদ বহন করে আনে। এই আইন উন্নেজিত জনগণের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা থেকে তাদের রক্ষা করে ... এই আইন যত নমনীয় কিংবা অনন্মনীয়ই হোক না কেন, 'আইনের মাধ্যমে সুবিচারের প্রক্রিয়া অবশ্যই ছিল আইনশূন্যতার চাইতে অনেক উন্নত'।

মওদুদ আহমদ-এর হিসাব মতে দালাল আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আনুমানিক সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার এবং সমান সংখ্যক ব্যক্তি পলাতক ছিলেন বলে ধরণা করা হয়। অন্য আরেক হিসেব মতে ২৪.০১.৭২ থেকে ৩০.১১.৭৩ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জন দালাল গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ৭৫২জন দালাল দণ্ডিত হয়।

দালালদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে বঙবন্ধু অভ্যন্তরীণ চাপের সম্মুখীন হন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার আত্মীয় ছিল দালাল। এদের মুক্তির জন্য প্রচণ্ড তদবির শুরু হয়। তাছাড়া সে সময় পাকিস্তানে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বাঙালি (১,৬০,০০০ সরকারি কর্মচারী, ৩৩,০০০ সেনাবাহিনীর সদস্য) আটকা পড়েছিল, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙবন্ধুর উপর প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, প্রয়োজনে দালালদের মুক্তি দিয়ে হলেও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এমনি পরিস্থিতিতে বঙবন্ধু ৩০.১১.৭৩ তারিখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তবে ধর্ষণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। ক্ষমা ঘোষণার পর গ্রেফতারকৃত ৩৭,০০০ ব্যক্তির মধ্যে ২৬,০০০ মুক্তি পেলেও ১১,০০০ ব্যক্তি নির্দিষ্ট অপরাধে কারাগারে আটক ছিল যাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। “১৯৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল

করেন ordinance no. 63 of 1975-এর মাধ্যমে জেনারেল জিয়ার সামরিক সরকার দালাল আইনের নিরাপত্তা করজটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। '৭৬ সালেই জিয়া সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল করার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। একই সঙ্গে জিয়া একান্তরের ঘাতক দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগ করে দেন। যেসব শীর্ষ স্থানীয় দালাল, রাজাকার, আলবদরদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের জন্য '৭৬-এর জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সার্কুলার জারী করে যাতে বলা হয় এসব ব্যক্তি নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করতে পারে'।

গ. যুক্ত বিধবস্ত দেশ পুনর্গঠন

পুনর্বাসন পদক্ষেপ

পুনর্বাসনের বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বঙবন্ধু শাসনকার্য শুরু করেছিলেন। ভারতে আশ্রয়হৃৎকারী প্রায় এককোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা, দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৪৩ লক্ষ বিধবস্ত বাসগৃহ পুনর্নির্মাণ করা এবং এদেরকে খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা ছিল সরকারের বিরাট দায়িত্ব। সেসময় প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। স্থানীয় পরিষদগুলো ছিল পাকিস্তানপক্ষীদের দখলে। নতুন সরকার প্রচুর পরিমাণ আঙর্জাতিক আণ সামগ্রী লাভ করলেও সেগুলির সুষ্ঠু বিতরণ করা বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে অসম্ভব ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত পুনর্গঠিত করেন। পাশাপাশি গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত আণ কমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় (৯.১.১৯৭২)। গ্রামের আয়তন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ৫ থেকে ১০ সদস্যের 'আণ ও পুনর্বাসন কমিটি' গঠন করা হয়। আওয়ামীলীগপক্ষী স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয়ে গ্রাম পর্যায়ে 'আণ কমিটি' গঠিত হয়। এভাবে ইউনিয়ন থানা ও জেলা আণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমিটিগুলোর মাধ্যমে সারাদেশে আণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন—এই যুক্তিতে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি দেশের সব স্থানীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে আণ কমিটিগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্বভাবতই অনেক স্থানে আণ কমিটির সদস্যরা দুনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এর ফলে আওয়ামী লীগের দুর্নাম হয়। ১৯৭৩ সালের ৪ মার্চ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রপত্রে দাবি করা হয় যে ঐ সময় পর্যন্ত সরকার ধ্বংসপ্রাণ প্রায় ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করেছেন। একই সময়ে সামগ্রিক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে মোট ব্যয় ৭২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

জাতীয়করণ কর্মসূচি

বঙবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীভুক্ত (২৬.০৩.১৯৭২-এ) পাট,

বন্ধ, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের অধীন আন্তর্ভুক্ত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিষ্ঠিত সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলো সমষ্টিয় করে ৬টি নতুন ব্যাংকে রূপান্তর করে। ৩.১.১৯৭২ তারিখে জারিকৃত ভারপ্রাণ রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশ (APO 1) এবং ২৮.২.১৯৭২ তারিখে ঘোষিত রাষ্ট্রপতির ১৬নং আদেশ (PO 16)-এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার প্রায় ৮৫% শিল্প-কল-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্র সেগুলোর মালিকানা এবং দখল গ্রহণ করে। এই ‘পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো’ জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে ‘রাষ্ট্রায়ন্ত খাত’ হিসেবে অভিহিত হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের (PO 16) আওতায় সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার সুযোগ ছিল কিন্তু জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না, কাউকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারেও সরকারের কোন ক্ষমতা ছিল না। জাতীয়করণ আইনের আওতায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বন্ধকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা—যা পূর্বেও সরকারি মালিকানায় ছিল—আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ন্ত খাতের অধীনে আনা হয়। এভাবে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী সম্পদ বিশিষ্ট পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয়।

জাতীয়করণ কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর সরকার হঠাতে গ্রহণ করেননি। এটি ছিল সওরের নির্বাচনের সময় ঘোষিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রূতি। তাছাড়া ছাইদের ১১ দফা দাবিতেও দেশের পাট, বন্ধ, চিনিকল ও ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের (৫নং দাবী) দাবি অত্যর্ভুক্ত ছিল। এমনকি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের দেয়া ঐতিহাসিক ২১-দফা কর্মসূচিতেও পাটশিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়েছিল।

যেহেতু জাতীয়করণকৃত সম্পদের পূর্ব মালিকরা প্রায় সকলেই অবাঙালি ছিলেন স্বত্বাবতই বাঙালিদের পক্ষ থেকে জাতীয়করণ সমর্থন করা হয়। তবে বঙ্গবন্ধুর সরকারের পক্ষে জাতীয়করণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এবং জাতীয়করণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মত রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র সরকারের ছিল না। মওদুদ আহমদ আশঙ্কা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন:

‘এমনকি ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর) এবং জাসদের মতো সমাজতাত্ত্বিক দলগুলোকেও এই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সমসাময়িক প্রশাসনিক কাঠামোতে এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে তারা কতটুকু সফলকাম হতো, সে নিয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে’।

কৃষি সংস্কার

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক শাসনভাব গ্রহণের সময় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছিল কৃষিখাত নির্ভর। বঙ্গবন্ধু জানতেন যে কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এজন্য তিনি সুবজ বিশ্বিদের ডাক দিয়েছিলেন। কৃমক বাঁচলে দেশ বাঁচবে'-এ শ্লোগানকে শুধু শ্লোগান হিসেবেই ব্যবহার করেনি বঙবন্ধু নেতৃত্বাধীন সরকার। মুক্তিযুদ্ধের পর ২২ লক্ষেরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করার দায়িত্ব বর্তীভূত হয়েছিল। সে দায়িত্ব দক্ষতার সাথেই পালন করেছিল বঙবন্ধুর সরকার। 'এই পুনর্বাসন ছিল সত্যিকার অর্থেই পুনর্বাসন। শুধু বসতবাড়ির জন্য কয়েকটি টিন কিংবা একটি লাঙ্গল কেনার টাকা দিয়ে দায়সারাভাবে কাজ সারা হয়নি। তাদের কৃষিয়ন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষিবিষয়ক মৌলিক কাঠামো নির্মাণে সহায়তাদানের পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, কীটনাশক সরবরাহ করেছিল'। কৃষি ক্ষেত্রে বঙবন্ধুর সংক্ষার নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- (১) জমির সমস্ত বকেয়া খাজনা মণ্ডকুফসহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মণ্ডকুফ করেন (২৬.৩.১৯৭২);
- (২) পরিবার পিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করেন;
- (৩) দখলদার পাকিস্তানি শাসনামলে রূজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে ঝীলী কৃষককে মুক্তি দেয়া হয় এবং তাদের সকল বকেয়া ঝণ সুদসহ মাফ করে দেয়া হয়;
- (৪) ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে হাসকৃতমূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০ গজীর নলকূপ ও ৩০০০ অগজীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সনে এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। সেচ সুবিধে বৃক্ষির পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে ১৯৭২ সালেই কেবল মাত্র অধিক ফলনশীল ১৬,১২৫টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ এবং ১,০৩৭ টন গম বীজ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সারের দাম বিশ্ববাজারের চেয়ে হাসকৃত মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের মূল্য মণ্ড প্রতি ছিল যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। ফলে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সনে রাসায়নিক সারের ব্যবহার গড়ে ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪০ শতাংশ, উন্নত বীজ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।
- (৫) ধান, পাট, তামাক ও আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এসব পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্য বিক্রয়মূল্য ধার্য করে দেয়া হয়;
- (৬) কৃষি গবেষণাকেও বঙবন্ধু গুরুত্ব দেন। কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়;
- (৭) বঙবন্ধু ১৯৭৩ সালের আট মাসের মধ্যে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুর্ণোদয়মে চালুর ব্যবস্থা করেন;
- (৮) ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বঙবন্ধু বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী বি এম আকবাসকে ২১.১.৭২ তারিখে দিল্লী পাঠান এবং শুকনো মণ্ডসুমে পদ্মা নদীতে ৫৪,০০০

কিউসেক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভ করেন। পঙ্গবন্ধু বেসন প্রকল্পেই সে লক্ষ্য মাত্রার ধারে কাছেও যেতে পারেনি;

(৯) সরকারিঃঃ খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের মধ্যেই ১০০টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়;

(১০) কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ বলদ ও ৫০ হাজার গাভী এবং ৩০ কোটি টাকার কৃষি ঝণ বিতরণ করা হয়;

কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের উন্নুন্দ করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' নামে কৃষকদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এভাবে কৃষক-দরদি নীতি গ্রহণের ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয় তারই ফলশ্রুতিতে আজ কৃষি ক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা সংস্কার

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জাতীয় অগ্রগতি নির্ভরশীল। বঙ্গবন্ধু সেই যুদ্ধবিধবস্ত পরিবেশেও মানব সম্পদের উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষার বিকাশের উপর জোর দেন। এমনকি ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার সন্মিলিত হয়েছিল:

(১) একই পক্ষতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্তসকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (২) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রদোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (৩) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'।

শাসনভার গ্রহণের মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কুদরত-ই-খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনা ভিত্তিক বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে একটি রিপোর্ট ১৯৭৪ সালের ৩০মে সরকারের নিকট দাখিল করেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি চেলে সাজানোর উদ্দেয়গ বঙ্গবন্ধুই নিয়েছিলেন। কমিশন রিপোর্টের অপেক্ষা না করে তিনি কতিপয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেমন :

- মার্চ ৭১ থেকে ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত সময়কালের ছাত্রদের সকল বকেয়া টিউশন ফি মওকুফ করেন;
- শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন;
- আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু পত্রম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করেন এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন;
- বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে তিনি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে

সরকারিকরণ করেন। এর ফলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সরকারি হয়;

- বঙবন্ধুর সরকার ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন;
- বঙবন্ধুর আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্ত্বাসন প্রদান।'

বঙবন্ধু অফিস-আদালতে বাংলা প্রচলনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেনাবাহিনীসহ সকল অফিসে বাংলা চালু করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা একাডেমিতে সাঁটলিপি, মুদ্রাঙ্কর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়। জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সারমর্ম নিম্নরূপ

কমিশন প্রস্তাব করেন যে, দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সার্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। . . .

এজন্য অন্তত আট বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রয়োজন। এ কারণে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষাকালে গণ্য করে . . . প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে তাকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এক অভিন্ন ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজন মতো দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নৈশ স্কুল চালু করতে হবে . . . মাধ্যমিক স্তর প্রসঙ্গে কমিশনের প্রধান সুপারিশ হল দেশের বাস্তব অবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও জীবন পদ্ধতি বিবেচনা করে এই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংহানের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে (১৪-১৭ বছর বয়সের) প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থী প্রতিবছর পড়াশুনা ত্যাগ করে, কিন্তু জীবিকা অর্জনের সহায়ক কোন শিক্ষা তারা পায় না। কাজেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রারম্ভিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষাক্রম মূলত: দু'ভাগে বিভক্ত হবে: বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। উভয় ধারাতেই নবম ও দশম শ্রেণীতে কয়েকটি বিষয় অবশ্য পাঠ্য থাকবে, এ ছাড়া অন্য কতকগুলো বিষয় শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বেছে নেবে। বৃত্তিমূলক ধারায় মাধ্যমিক শিক্ষা হবে তিনি বছরের, সাধারণ ধারায় হবে চার বছরের . . .

কিন্তু দুর্বাগ্য এই যে, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের পূর্বেই বঙবন্ধু নিহত হন।

অর্থনৈতিক সংক্ষার

বঙবন্ধু সরকার শাসনভাব গ্রহণের পরপরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সরকার যত দ্রুত

প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান এবং বেদেশিক বাণিজ্যেরও আয় ৮০%
রাষ্ট্রীয়স্ত করে। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘা এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির
খাজনা মওকুফ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার
১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। ১৯৭৩ সালের ১
জুলাই থেকে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) কার্যকর হয়। প্রথম পাঁচশালা
পরিকল্পনায় যুক্তবিধবস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এর
দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বিশ্বেষণ করলে আমরা ঐ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।
প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ :

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্যহাস। আর লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে
বলা হয়েছিল: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, এবং সমতা-ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য
কার্যকর আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।
২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।
৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করা। আর আনুষ্ঠানিক
খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানব শক্তি
ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার
কাঠামো শক্তিশালী করা।
৪. নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল, কেরেসিন,
চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজার মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে
রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।
৫. বণ্টন নীতিমালা (পুনর্বিন্দিনমূলক আর্থিক নীতিকৌশল) এমন রাখা যাতে দরিদ্র
জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় (এবং উচ্চ
আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।
৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-
দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা; গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা।
অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।
৭. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ
বৃদ্ধির লক্ষ্যে রণ্ধনি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো
পুনর্বিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে
বিদেশ নির্ভরতা ভিত্তিক অনিষ্টয়তা হ্রাস করা।
৮. কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে
স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।
৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কমিটমেন্ট এবং সামাজিক চেতনা

বিকাশ প্রক্রিয়া তুরাধিত করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

বঙ্গবন্ধু পঞ্জবাষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। প্রথম পঞ্জবাষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঝপথে গভীর ঘড়্যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে কি হতো? সে প্রশ্ন ড. আবুল বারকাতেরও। তাঁর প্রশ্ন: ‘বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়ন দৌড়ে কোথায় দাঁড়াতো?’ ড. বারকাত এই প্রশ্নের একটা উত্তরও কল্পনা করেছেন: ‘বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে এবং সেই সাথে গণতন্ত্র-জাতীয়তাবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা-সমাজতন্ত্র সংশ্লিষ্ট চার -দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবণতা যদি বহাল থাকতো তাহলে ... মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো তা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আজকের মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো।’

যা হোক, যুক্তিবিধবন্ত বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন:

১. প্রথম পাঁচশালা (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনায় বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ৬২% থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭%-এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন;
২. তিনি নতুন চারটি করপোরেশন গঠন করেন, যেমন:
 - (ক) বাংলাদেশ জুট করপোরেশন
 - (খ) বাংলাদেশ সুগার করপোরেশন
 - (গ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল করপোরেশন এবং
 - (ঘ) বাংলাদেশ গ্যাস অ্যান্ড অয়েল করপোরেশন।
৩. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিল্প বৰ্ণ সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন; এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ১০৫০টি নতুন শাখা স্থাপন করেন;
৪. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এর ৩৩৫টি শাখা স্থাপন করেন;
৫. স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নতুন মুদ্রা চালু করেন;
৬. তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জন্য সাহায্যদাতা গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন;
৭. গ্রাম বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বন্ডায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।
৮. বঙ্গবন্ধু ঘোড়াশাল সারকারখানা, আওগাঞ্জু কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্পস্থাপন, বঙ্গ শিল্পকলকারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলা করে একটি সুস্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃক্ষশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জোর প্রয়াস গ্রহণ করেন।

সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ

বঙ্গবন্ধুর শাসনভাব গ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও সদ্য স্বাধীন

দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকার কমকতা-কমচারাদের জন্য নতুন বেতন কমিশন গঠন করে ১০ শত বিশিষ্ট নতুন বেতন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছিলেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তরিক ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১ মে তিনি মে দিবসে শ্রমিকদের মজুরির হার বৃক্ষির ঘোষণা দেন।

যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ

(ক) সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

মুক্তিযুক্তের সময় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও শুরুত্ব দেন। তিনি ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুক্তের সময় ধ্বংসপ্রাণ সকল ব্রিজ-সেতু পুনর্নির্মাণ করেন। এবং অতিরিক্ত ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করেন। ঢাকা-আরিচা রুটের বড় বড় সড়ক সেতুগুলো বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে নির্মিত হয়। সেসময় ধ্বংসপ্রাণ রেল সেতুগুলোও চালু করা হয়। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছিল বঙ্গবন্ধুর এক বৈপ্লাবিক প্রয়াস। তাঁর উদ্যোগে গঠিত কমিশন ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়ন করে (দ্রষ্টব্য, ইডেফাক: ২২.১.১৯৭৫)।

(খ) বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধুর সময়ে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা-কুমিল্লা রুটে বিমান চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক রুটেও একটি বৌয়িৎ সংযোজিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন ঢাকা-লন্ডন রুটে বিমানের প্রথম ফ্লাইট চালু হয়। কুর্মিটোলার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে।

(গ) সমুদ্র ও নৌপরিবহন ক্ষেত্রে উন্নয়ন

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন গঠিত হয়। এই শিপিং করপোরেশন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কোষ্টারসহ ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে।

(ঘ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন

মুক্তিযুক্ত চলাকালীন সময়ে সারা দেশে বিদ্যুৎ সাব স্টেশনগুলো ধ্বংস প্রাণ হয়েছিল। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোড়াউনগুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি ও তার কিছুই মজুদ ছিল না। এগুলো ছিল আমদানিযোগ্য পণ্য। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ৫০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানি করেন এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৫০০ কিমি বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেন এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে উৎপাদিত ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ থেকে ডিসেম্বরে ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী পল্লী বিদ্যুৎ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়।

এবং এমনকি সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লী বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি সামৃদ্ধিক হয়।

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাণ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করেন। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধু পাবর্ত্য চট্টগ্রামে উপগ্রহ ডু-উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেন।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হ্বার পর (১৬.১২.৭২) গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ঘোষণা জারি করেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)-এর সভাপতি মওলানা ভাসানী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের আহ্বান জানান (৩১.১২.১৯৭২)। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জন্মালগ্ন থেকেই সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার সেসময় নিষিদ্ধ ছিল। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৬, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৬টি আসনে জয়লাভ করেন।

আদমশুমারি অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধবস্ত বাংলাদেশে আর্থিক সংকট ও নানান ব্যস্ততার মাঝেও ১৯৭৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি সম্পন্ন করেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

- (ক) সরকার গঠনের তিনদিনের মধ্যেই (১৫.১.১৯৭২) বঙ্গবন্ধু এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে দেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়া দৌড় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি একই সাথে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়াদী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করেন।
- (খ) বঙ্গবন্ধু ২৪.৫.১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনেন;
- (গ) ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ৯টি বঙ্গ রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন;
- (ঘ) তিনি ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন;
- (ঙ) ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্বোধন করেন;
- (চ) 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়'—এই আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যে ২০.৩.৭৫ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য এক অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন।

বাংলাদেশের তবলীগ জামাতের কেন্দ্র কাকরাহল মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। টংগীতে তবলীগের বিশ্ব ইজতেমার স্থান করে দেন।

- (ছ) ১৫.১২.৭৪ তারিখে বঙবন্ধু দুঃস্থ শিল্পী সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণার্থে সরকারিভাবে 'বঙবন্ধু সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।
- (জ) ৭.৮.৭৫ তারিখে দুঃস্থ ক্রীড়াবিদদের কল্যাণার্থে 'বঙবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়।

নারীদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা

বঙবন্ধু দুষ্ট মহিলাদের কল্যাণের জন্য ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি করেন। চাকরির সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য তিনি ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি ড. নীলিমা ইব্রাহীমকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ ও বেগম নূরজাহান মুরশিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে পদক্ষেপ গ্রহণ

(ক) সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার দিকেও বঙবন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। ৬.৩.১৯৭২ তারিখে তিনি বিডিআর গঠনের আদেশ জারি করেন। বঙবন্ধু ৮.৪.১৯৭২ তারিখে পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১১.৩.১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমী উদ্বোধন করেন। বঙবন্ধু যুগোশ্বাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অন্তর্শন্ত্র ও সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অন্ত সংগ্রহ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করেন মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। তিনি ক্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমান বাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার ক্রয় করেন। তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিশন থেকে সংগৃহীত হয় সাঁজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক (যা পরবর্তীকালে তাঁকে হত্যা করতে খুনিরা ব্যবহার করে)। সেনাবাহিনীর জন্য পোশাক ও যন্ত্রপাতি অন্যের জন্য বঙবন্ধু সরকার গরতের কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে লাভ করে। উন্নত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বঙবন্ধু সামরিক অফিসারদেরকে বিদেশে প্রেরণ করেন।

বঙবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন।

(খ) বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে বঙবন্ধু প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী হিসেবে জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর ৬ ভাগের ১ ভাগ। মুক্তিযোদ্ধাদের ফেরত দেয়া অন্ত্রে তাদেরকে সজ্জিত করা হয়েছিল।

পররাষ্ট্রনীতিতে সাফল্য অর্জন

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন-স্বকীয়তার পরিচয় দেন। তিনি কোন পরাশক্তির চোখরাঙানি কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন দেশের সন্তুষ্টি বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করেননি। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। বঙ্গবন্ধু যখনই কোন আন্তর্জাতিক ফোরাম (জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন, ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠক ইত্যাদি) কিংবা দেশে গেছেন, তিনি বলিষ্ঠ কঠে তাঁর জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করেছেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তাতে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শাস্তিপূর্ণ পরিবেশেই কটলঞ্চ জাতীয় স্বাধীনতার ফলভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারভূর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শাস্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রূতি। এইজন্য সমর্থোত্তর অগ্রগতি, উদ্দেশ্যনা প্রশংসন, আন্ত সীমিতকরণ এবং শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা তথ্য বিশ্বের যে কোন অংশে যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই।'

পররাষ্ট্র নীতিতে বঙ্গবন্ধু সাফল্য অর্জন করেন। যেমন:

- (ক) সরকার অধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যেই (১৪.৩.১৯৭২) তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- (খ) বঙ্গবন্ধুর কৃটনৈতিক উদ্যোগের ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট ৪.৪.৭২ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে;
- (গ) বঙ্গবন্ধুর সরকার ১০.৫.১৯৭২ তারিখে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।
- (ঘ) ১৯৭৩ সালের ২৩ মে মাসে ঢাকায় বিশ্ব শাস্তি পরিষদের উদ্যোগে এশিয়া শাস্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরী' পদক লাভ করেন।
- (ঙ) ১৭.৯.৭৪ তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।
- (চ) ২৫.৯.৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বাঙালির মাতৃভাষার মর্যাদাকে বিশ্বের দরবারে উন্নত করেন।
- (ছ) বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কৃটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে ১২১টি দেশের

শীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য ও ইন্দোপ্রিম প্ররাষ্ট্র

সম্মেলনের সদস্যপদসহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে সাভার ও মেহেরপুরে শৃঙ্খিসৌধ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করেন (৯.৩.১৯৭২)। ১৬.১২.৭২ তারিখে সাভারে জাতীয় শৃঙ্খিসৌধের এবং ২২.১২.৭২ তারিখে ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

বঙ্গবন্ধু প্রতিটি শহীদ পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি গঠন করেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। ১৫.১.৭৩ তারিখে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের শীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ খেতাব প্রদানের তালিকা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীর শ্রেষ্ঠ, ৬৮ জনকে বীর উত্তম, ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর প্রতীক পদক প্রদান করেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (অব:) আতাউল গণি ও সমানীকে জেলারেল এবং চিফ অব স্টাফ কর্ণেল (অব:) আব্দুর রবকে মেজর জেনারেল পদে ভূষিত করেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারের কিছু সমালোচিত পদক্ষেপ

(ক) বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে নির্বর্তনমূলক আইনের বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে 'ক্ষতিকর কার্য' থেকে বিরত রাখার জন্য আটক রাখতে পারবে। গ্রেণারকৃত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীত গ্রেণার কারণ অবহিত করা, ও আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেয়া হয়। এই আইনের ১৫ ধারা বলে ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক কাজ, ১৬ নং ধারা বলে ক্ষতিকর রিপোর্ট প্রকাশ, ১৭ ও ১৮ নং ধারা বলে কোনো দলিল তৈরি, মুদ্রণ বা প্রকাশনা এবং 'ক্রতিপয় বিষয় প্রকাশনা থেকে যে কোন ব্যক্তিকে বা সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯ ও ২০ নং ধারা বলে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হৃষকিস্বরূপ কোনো সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান করা হয়। ২৪ নং ধারা বলে সাক্ষ্য আইন জারির ক্ষমতা, ২৫ নং ধারার মাধ্যমে মজুদদারি, কালোবাজারি, চোরাচালানি, ভেজাল দেয়া, মুদ্রা বা স্ট্যাম্প জাল করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীকে সাজা প্রদানের বিধান করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনে সমাজবিরোধী তৎপরতা রোধের জন্য করা হয়েছিল। এ আইন অদ্যাবধি কোন সরকারই বাতিল করেনি বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

(খ) রক্ষীবাহিনী গঠন

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা

বাহিনী ছিল না। সেনাবাহিনীও তখন সুসংগঠিত ছিল না। বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের সুযোগ ছিল না। এমনি অবস্থায় ষড়যজ্ঞকারীরা দেশে নেরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করলে সরকার জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল এই বাহিনী পুলিশকে সত্ত্বিয়ভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীকেও সাহায্য করবে। তবে এই বাহিনী থাকবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ' প্রণয়ন করা হয় (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২১, ১৯৭২) তবে তা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়। এই আইনের ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, 'সুনির্দিষ্ট' কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।' ঐ আইনে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বর্ণন করা হয়। ১৭ নং অনুচ্ছেদে সরকারকে রক্ষীবাহিনীর জন্য 'আইন প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের' ক্ষমতা দেয়া হয়। ৮নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয় যে, 'ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যে কোন আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যে কোন সদস্য বা অফিসার ৮নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোন আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিঙ্গ থাকার সম্বেদনশীল যে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করা, (২) যে কোন ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশ বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যেকোন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন . . .'। রক্ষীবাহিনীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদ লিখেছেন:

যাই হোক জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোন ভালো কাজই করেনি, একথা ঠিক নয়। বিপুল পরিমাণে বেআইনী অন্ত এরা উদ্ধার করেছে এবং আটক করেছে প্রচুর পরিমাণে চোরাচালানকৃত পণ্য। কালোবাজারী এবং আবেধ গুদামজাতকারী রক্ষীবাহিনীর নাম অনেই আতঙ্কবোধ করতো।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর রক্ষীবাহিনী ভেঙে দেয়া হয়।

(গ) বাকশাল গঠন

আমরা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনমতো দেশে একমাত্র 'জাতীয় রাজনৈতিক দল' গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়। উক্ত দলের নামকরণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। এভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামক একটি একক জাতীয় দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এর চেয়ারম্যান এবং বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সকল সংসদ সদস্য ও সকল মন্ত্রী এর সদস্য বলে গণ্য হন। রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বাকশালের গঠনতত্ত্ব ঘোষণা করেন। গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী জাতীয় দলের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণের নামও ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি উভয়েরই সভাপতি এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সশস্ত্রবাহিনীর তিন প্রধান, তিনজন উপাচার্য, তিনজন সংবাদ সম্পাদক, রক্ষী বাহিনীর প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, চিকিৎসক ও সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গঠনতত্ত্ব অনুসারে বাকশালের ৫টি অঙ্গসংগঠন ছিল (১) জাতীয় কৃষক লীগ, (২) জাতীয় শ্রমিক লীগ, (৩) জাতীয় মহিলা লীগ, (৪) জাতীয় যুবলীগ, ও (৫) জাতীয় ছাত্রলীগ। চেয়ারম্যানকে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অঙ্গসংগঠন ও সংস্থা ইত্যাদি গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এসব অঙ্গসংগঠন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করবে মর্মে স্থির হয়। ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় রাষ্ট্রপতি এক নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে ৬০টি নতুন জেলা গঠন করে প্রতিটি জেলায় একজন গভর্নর নিয়োগের ও এক একটি প্রশাসনিক পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। জেলা গভর্নর হবেন পরিষদের প্রধান। এ ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে বাকশাল কর্মসূচি কার্যকর হতে পারেনি। তাই এর ভাল-মন্দ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবে বাকশাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বঙ্গবন্ধু যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্যুর্ঘাতিন কঠে বলেন যে, 'দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং শোষিতের সমাজতত্ত্ব ও গণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার' মহৎ লক্ষ্যেই সংবিধানে সংশোধনী আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। তিনি বলেন দেশে বর্তমানে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা তা আর চলতে দেয়া যায় না। তিনি সংসদকে লক্ষ্য করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা সঙ্গেও জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল শোষণ-অবিচার-নির্যাতন দূরীকরণের অপরিহার্য প্রয়োজনেই সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনা অবশ্যিকী হয়ে পড়েছিলো। বঙ্গবন্ধু একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মানুষের ওপর সামগ্রিক শোষণ অপসারণের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

বাকশাল অর্থ কেবল একটি একক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা নয়। বাকশাল গঠনের মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু যে দীর্ঘ ভাষণ দেন তাতে বাকশাল কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- (১) 'কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য।'
- (২) 'হ্যা, প্রেসিডেন্সিয়াল ফরম অব গভর্নমেন্ট করেছি। জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

করবে। পার্লামেন্ট থাকবে। পার্লামেন্টের নির্বাচনে একজন, দুইজন, তিনজনকে নথিলেশন দেওয়া হবে। জনগণ বাছবে কে ভালো কে মন্দ। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র, আমরা চাই না শোষকের গণতন্ত্র। এটা 'পরিষ্কার'।

- (৩) (আমাদের লক্ষ্য) : 'এক নম্বর হলো দূনীতিবাজ খতম করা। দুই নম্বর হলো, কলে-কারখানায়, ক্ষেত্রে খামারে প্রোডাকশন বাড়ানো। তিন নম্বর হলো, পপুলেশন প্রাণিং। চার নম্বর হলো, জাতীয় ঐক্য।
- (৪) 'জাতীয় ঐক্য গড়বার জন্য একদল করা হয়েছে। যারা বাংলাদেশ ভালবাসে, এর আদর্শে বিশ্বাস করে, চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানে, সৎ পথে চলে তারা সকলেই এই দলের সদস্য হতে পারবে। যারা বিদেশি এজেন্ট, যারা বহিঃশক্তির কাছ থেকে পয়সা নেয়, এতে তাদের স্থান নেই। সরকারি কর্মচারীগণও এই দলের সদস্য হতে পারবে। কারণ, তারাও এই জাতির একটা অংশ। তাদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছি, একত্বাবক্ষ হয়ে দেশের কাজে লাগতে হবে।'
- (৫) 'এই জাতীয় দলের আপাতত পাঁচটা ব্রাঞ্ছ হবে। একটা শ্রমিক ভাইদের অঙ্গদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অঙ্গদল মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।
- (৬) 'যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। ভূল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ডয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্র্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ। এর জমি মালিকের থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্মেলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আন্তে আন্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যঁরা টাউট আছেন, তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে। তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যেই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বৎসরের প্র্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ শত থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।'

দ্বিতীয়ত থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী বা সরকারি কর্মচারি যে-ই হন, একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী, তার মধ্যে আমরা কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুব প্রতিনিধি থাকবে,

কৃষক প্রতিনিধি থাকবে। তারাই থানাকে চালাবে। সেই মহকুমায় একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে। সেখানে তারা সরকার চালাবে। এইভাবে আমি একটা সিস্টেম চিন্তা করেছি এবং করব বলে ইনশাআল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আমি আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি চাই।'

- (৭) আর একটা কথা বলতে চাই। বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জিয়ান যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ওই মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস হয়, তিনি বছর, চার বছরের আগে শেষ হয় না। এই বিচার বিভাগকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রাইবুনাল করবার চেষ্টা করছি। সেখানে যাতে মানুষ এক বছর, দেড় বছরের মধ্যে বিচার পায়, তার বন্দোবস্ত করছি। আশা করি সেটা হবে।'

বঙ্গবন্ধু এই কথাগুলোই হলো বাকশাল কর্মসূচি। এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে ফল ভাল হতো না, মন্দ হতো তা' এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ বাকশাল কর্মসূচি তো আলোর মুখ দেখেনি। দেখতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাকশাল কর্মসূচির অকাল মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে: বাকশাল কর্মসূচি কাদের স্বার্থে আঘাত হানতো? মওদুদ আহমদ সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন:

সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা অংশ এতে আতঙ্কিত বোধ করে। প্রকৃত পক্ষে শেখ মুজিবের ব্যাপক কর্মসূচিতে সমাজের প্রতিটি প্রভাবশালী শ্রেণীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। আমীণ নেতৃত্বের খবজাধারী আমীণ এলিট শ্রেণী, সমবায় ব্যবস্থাধীনে জমির মালিকানা হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আমলারাও তাদের উপর স্থাপিত একক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারেননি। সেনাবাহিনীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা হয়। বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধ্যন্তরে করে তোলায় তা বিচারক এবং আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষেত্রের সঞ্চার করে। সর্বোপরি আওয়ামী লীগ সেই দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও সাবেক দলীয় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটায় নিদারণ অস্বাক্ষির শিকার হল।'

বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচির বাস্তবায়িত না হলেও বাকশাল কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার পরবর্তী কয়েক মাসে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন:

১৯৭৫ সালের জুন মাস নাগাদ দেশের অর্থনীতিতে মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে ... মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯৩৭.৭৬ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৮১৪.৩৩ কোটি টাকায় নেমে আসে এবং একই সময়ের ব্যবধানে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১১১.৪৯ কোটি টাকা থেকে ৩৫০.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। খাদ্য শস্যের মজুদ পরিস্থিতি

অনুকূলে চলে আসায় চালের মূল্যে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আরো
কতিপয় নিয়ন্ত্রণাজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যও নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে থাকে। জুন মাস
নাগাদ চালের দাম জানুয়ারী মাসে সের প্রতি ৮ টাকা থেকে কমে ৫.৫০ টাকায়, লংকুথ
গজপ্রতি ১৩ টাকা থেকে ১১.৫০ টাকায়, সরিষার তেল সের প্রতি ৪১.৬৮ টাকা থেকে
৩০.৩৭ টাকায়, আলু সের প্রতি ২.০৫ টাকা থেকে ১.৫০ টাকায়, কুই মাছ ১৪.১৮
টাকা থেকে ১০ টাকায় এবং কেরোসিন তেল ১.৪০ টাকা থেকে ১.২০ টাকায় নেমে
আসে।

এতে করে জীবনযাত্রার ব্যয় ভারেও উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ঢাকা
শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক জানুয়ারী মাসের ৪৫৮.৫ থেকে এপ্রিল
মাসে ৪১৬.৯ এ এবং খাদ্যমূল্য সূচক একই সময়ে ৫৪৬.৩ থেকে ৪৫৯.০-এ হ্রাস
পায়।

পরিস্থিতির উন্নতি চক্রান্তকারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে। তারা আর কাল বিলম্ব না করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে।

(ঘ) ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ

বঙ্গবন্ধু সরকারকে আরেকটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে। উক্ত দুর্ভিক্ষের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ্ত খাদ্য ঘাটতি, মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্টি খাদ্য ঘাটতি, ১৯৭২-৭৪ সময়ের খরা, বন্যা ও দেশী-বিদেশী চক্রান্ত কর্তৃতা দায়ী তা বিবেচনায় না নিয়ে একত্রফাভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারকে দায়ী করে অপপ্রচার চালানোর একটা প্রবণতা চলে আসছে। পাকিস্তান আগলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালের ৫ লাখ টন থেকে বেড়ে ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রায় ১৫ লাখ টনে উন্নীত হয়। ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা হয় তার ফলে ১৯৭০ সালে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ২২ লক্ষ টনে পৌছায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষি কাজ ব্যাহত হওয়া ও বন্যায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য ঘাটতি কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালের খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনায় ব্যাপক জলচ্ছাসে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে বন্যায় (এপ্রিল মাসে সিলেটে এবং জুলাই-আগস্টে সারা দেশে) প্রায় ১ কোটি টন ফসল নষ্ট হওয়ার ফলেই ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেসময় আজৰ্জাতিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যসাহায্য পাওয়া যায়নি। উপরন্ত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সেসময় খারাপ থাকায় খাদ্য পরিবহনেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া মজুদদারি ও চোরাচালান খাদ্য সংকট ভয়াবহ করে তোলে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতি সের মোটা চাউলের মূল্য ছিল ৩.৯০ টাকা, আগস্ট মাসে তা' হয় ৪.৭৮ টাকা, সেপ্টেম্বরে ৬ টাকা এবং অক্টোবর মাসে ৭.১৬ টাকায় উন্নীত হয়। সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সারাদেশে ৫,৭০০টি লঙ্গরখানা চালু করেছিল। কিন্তু এতৎসন্ত্বেও উক্ত দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসাব মতে ২৭,৫০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটেছিল।

বেসরকারি হিসেব মত তা তিনগুণেরও বেশি ছিল। ১৯৭৪ মালের নভেম্বর মাসেই পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসে।

(ঙ) ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের কাছেই পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। সেই ভারতীয় বাহিনীকে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। এটি বঙ্গবন্ধুর বড় কৃতিত্ব। এরপর ১৭ মার্চ (১৯৭২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সফরের সময় (১৯ মার্চ) তিনি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবায়নযোগ্য একটি ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে ‘বন্ধুত্ব, রক্ত ও আত্মাদানের মধ্য দিয়ে দু’দেশের গড়ে ওঠা সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ভিত্তি অর্জন করে। চুক্তিতে ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল। চুক্তির ভিত্তি ছিল উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ, যথা শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। চুক্তির প্রস্তাবনায় ‘সম্ভাব্য সকল রকমের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে’ উভয় দেশের সীমান্তকে চিরস্তন শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে’ চিহ্নিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- (১) ‘উভয় দেশ নিজ নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে’;
- (২) ‘উভয় পক্ষ সারা বিশ্বের উপনিবেশবাদ ও বণবৈষম্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনসমষ্টির সাথে একাত্তা ঘোষণা করে তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন প্রদান করবে’;
- (৩) ‘উভয়পক্ষ তাদের জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অটল থাকবে’;
- (৪) ‘যেকোন আন্তর্জাতিক সমস্যায় উভয়পক্ষের স্বার্থে তারা পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় করবেন’;
- (৫) ‘উভয়পক্ষ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি ক্ষেত্রে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করবে’;
- (৬) ‘বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীসমতল উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ ও সেচব্যবস্থা উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষা চালাবে’;
- (৭) ‘উভয়পক্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পর্ক অব্যাহতভাবে ভাল রাখবে’;
- (৮) ‘কোন এক পক্ষ অপরপক্ষের সঙ্গে বিবাদরত কোনো শক্তির সাথে সামরিক মৈত্রী স্থাপন থেকে বিরত থাকবেন, একে অপরের ওপর কোন আগ্রাসনমূলক তৎপরতা পরিচালনা করবেন না এবং নিজ ভূখণ্ডে এমন কোনো সামরিক

আয়োজনে ব্যস্ত থাকবেন না যা অপর পক্ষের জন্য সামাজিক কান্তি বা নিরাপত্তার উপর হমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে’;

- (৯) ‘উভয় পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সশন্ত সংগ্রামে যে কোন তৃতীয় পক্ষকে সহযোগিতা দানে বিরত থাকবে’। ‘কোন কারণে এক পক্ষ অন্য আরেক পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হবার হমকীর সম্মুখীন হলে উভয় পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য আলোচনায় বসে তাদের শাস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেই আক্রমণ বা হমকী নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন’;
- (১০) ‘কোন পক্ষ এই চুক্তির পরিপন্থী হয় এমন কোনো বিষয়ে কোনো এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কোনো রকমের প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিরত থাকবেন’।

আলোচ্য চুক্তিকে বঙ্গবন্ধুর সমালোচকরা ‘গোলামির চুক্তি’ বলে সমালোচনা করে। কিন্তু চুক্তির ধারাগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, বঙ্গবন্ধুর ঐ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মর্যাদা সামান্যতমও কমাননি। চুক্তিটি ‘গোলামির’ হয়ে থাকলে ১৯৭৫-১৯৯৬ সময়কালে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা তা বাতিল করতে পারতেন।

অতএব বলা যায়, বঙ্গবন্ধু সরকার সম্পর্কে বিরোধী পক্ষ যে সকল বিষয় নিয়ে উচ্চবাচ করেন, সমালোচনা করেন সে বিষয়গুলো কোনটিই সমালোচনা করার মতো নয়।

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে কেবল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে উপহার দেননি, তিনি মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যে যুক্তিবিপন্ন পোড়ামাটির এক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শত সমস্যা জয় করে তাকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। বাংলাদেশের নিরন্তর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠান। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার ছিল ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন, দেশকে স্বাভাবিক করেন, সংবিধান প্রণয়ন করেন, এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটান, মদ-জুয়া-ঘোড়া দৌড়সহ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করেন, নারী পুনর্বাসন সংস্থা গঠন করেন, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেন, কৃষির উন্নতি ঘটান, শিল্প-কল-কারখানা, ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ করে সচল করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেন, ১২১টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেন, বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ ও ইসলামী বুকের সদস্য করার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিতে সফলতা অর্জন করেন এবং এভাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের জুন মাসে লন্ডনের সানডে

যে পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, সে পরিস্থিতি তিনি যেভাবে আয়ত্তে এনেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে সকল বিদেশীর তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন . . . এটা সত্যই একটা অলৌকিক ঘটনা যে স্বাধীনতার পর অন্তত পাঁচ লাখ লোকও নিহত হ'লো না, এখন পর্যন্তকেউ অনাহারে মারা যায়নি এবং সরকার দিবিয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এসব কিছুই শেষের জন্য সম্ভব হয়েছে।

সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে কাজ করি, দলীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিই তাহলে বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

ঘ. সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও আদর্শিক পটপরিবর্তন

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা কেবলমাত্র একজন বা কিছু ব্যক্তিকেই হত্যা করা ছিল না, সে হত্যাকাণ্ডটির উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শকে হত্যা করা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শুধু সংবিধান থেকে নয়, বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলা। স্বত্বাবতঃই হত্যাকাণ্ডটি ছিল সুপরিকল্পিত। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সুদূর প্রসার প্রভাব ছিল। নিম্নে 'তা' আলোচনা করা হ'লো :

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন পর্যন্ত একুশ বছরে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্যই বিকৃত করা হয়নি বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলে কৃঠারাঘাত করা হয়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একুশ বছরে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবিস্তৃত পটভূমি, তেইশ বছর ব্যাপী পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম, রাজনীতিবিদ, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি মানুষ প্রযুক্তির অপরিসীম আত্মত্যাগ, সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য অবদান, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকারের গৌরবময় ভূমিকা, শত-সহস্র বীর মুক্তিযোদ্ধার আত্মত্যাগ, তিরিশ লক্ষ শহীদের জীবনদান, চারলক্ষ নারীর সম্ম হানি প্রভৃতি সবকিছুই অস্তীকার করে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছিল। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের একজন সেন্টার কমান্ডারকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রচার করা হয় এবং একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে তাঁর ঘোষণাতেই হঠাতেই ২৭শে মার্চ (১৯৭১) থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে মাত্র নয় মাসের ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। ইতিহাস বিকৃত করা ছাড়াও ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একুশ বছরে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি সংগঠিত হয় এবং পুনর্বাসিত হয়।

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধান প্রণেতাগণ একান্তরের মুক্তিযুদ্ধকে 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম' এই অভিধায় অভিহিত

করেছিলেন। কিন্তু বঙবন্ধুকে হত্যার পর সেই অভিপ্রায়কে পরিবর্তন করে জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহাসিক যুদ্ধ'- অভিধায়ে পরিবর্তন করে। একাজটি করেন জিয়াউর রহমান। তিনি সামরিক বিধির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক- ১৯৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি, যথা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এর আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে পরিবর্তন করা হয়। ধর্ম নিরপেক্ষতার স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাগুলো সংযোজন করা হয়। সমাজতন্ত্রের স্থলে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার' কথাগুলো প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এভাবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান-মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই বিনষ্ট করেন। তাঁর সময়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটে। বঙবন্ধু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন, জিয়াউর রহমান সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং আরো অসংখ্য ধর্মভিত্তি রাজনৈতিক দল ও জোটের উন্নোব্র ঘটতে থাকে। এভাবে জিয়াউর রহমান সংবিধানে নিষিদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলকে বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে, শাহ আজিজুর রহমানের মতো কুখ্যাত দালালকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে, আব্দুল আলীম ও মওলানা মালানের মতো যুদ্ধাপরাধীদেরকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে এবং সর্বোপরি ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের খুয়া তুলে মুক্তিযুদ্ধের অবমূল্যায়ন করেছেন। জেনারেল জিয়া ইনডেমনিটির মতো অমানবিক আইন সংবিধানে সংশ্লিষ্ট করে বঙবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। জিয়াউর রহমান একান্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করা ও তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

বঙবন্ধুর সরকার (১৯৭২-৭৫) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ২৪.১.১৯৭২ তারিখে 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারী করেন। তাঁর আমলে বিচার কার্য শুরু ও হয়। ২৪.১.৭২ থেকে ৩০.১১.৭৩ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়। তারমধ্যে ৭৫২ জন দালাল দণ্ডিত হয়। ৩০.১১.৭৩ তারিখে বঙবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও তিনি 'ধৰ্মণ, খুন, খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করেননি। ক্ষমার অযোগ্য এরকম ১১ হাজার ব্যক্তি আটক ছিল। কিন্তু জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালে ৩১শে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করেন। বঙবন্ধুর সময় যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল জিয়া তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেন। একান্তরের ঘাতক দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগও তিনি দেন। এভাবে জিয়ার শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের সকল চেতনার বিনাশ ঘটে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদ এবং পরে বেগম খালেদা জিয়া একই পথ অনুসরণ করেছেন।

এরশাদ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন, যা জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনীর ধারাবাহিকতা মাত্র। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী এদেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছে। অষ্টম সংশোধনী মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতাকে সরাসরি আঘাত করেছে।

বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে ১৯৯১-এর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে সমর্থ হন। জামায়াতকে খুশী রাখতে স্বত্ত্বাবতঃই বেগম খালেদা জিয়া এরশাদের ৮ম সংশোধনীসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সকল রাষ্ট্রীয় নীতি অব্যাহত রাখেন। খালেদা জিয়ার দল - বিএনপির সমর্থনে জামায়াতে ইসলামীর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত জাতীয় সংসদে ১৮টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। এই ফলাফল লাভের পর ২৯.১২.৯১ তারিখে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আয়মকে তাদের দলের আমীর হিসেবে মনোনীত করে। ২০০১ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া দুই যুক্তাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অপমানিত করেন। ২০০১ সালের পর বাংলাদেশে মৌলবাদীদের উত্থান ঘটে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একুশ বছর ব্যাপী ক্রমাগত মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের ফলে সেসময়ের প্রজন্ম বিভাস্ত হয়। সে দীর্ঘসময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম মিডিয়াতে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। পত্র-পত্রিকায় ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বঙ্গবন্ধুর অবদান নিয়ে সামান্যই আলোচনা হ'তো। ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু যেভাবে উপস্থাপিত হওয়ার কথা, তা হয়নি। বরং বিভিন্ন ইসলামী দল ও জোটের নেতৃত্বাবলী, সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিবর্গ অধিকাংশ সংবাদপত্রের সাংবাদিকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডানপন্থি শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন সভা সমিতির আলোচনা সভায়, পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে ও কলাম লিখে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করেন। ফলে সেসময়কার তরুণ প্রজন্মের মনে মুক্তিযুদ্ধের কোন চেতনা সৃষ্টি হয়নি। তাদের চেতনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ নির্বাসিত হয়। তারা বেড়ে উঠে বিকৃত ইতিহাস শুনে শুনে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা না হলে, আর কয়েকবছর বঙ্গবন্ধুর শাসন অক্ষুণ্ণ থাকলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সুদৃঢ় হতো, দেশ উন্নত হতো এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িকতা সুদৃঢ় হতো।

সহায়ক শব্দ

আবু সাঈদ, আওয়ামী লীগের শাসনামল, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ : জাতি রাষ্ট্রীয় উদ্ঘব, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী ২০০০।

এইচ.টি. ইমাম, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭২-৭৫, ঢাকা ২০১৩

আবুল মাল আব্দুল মুহিত (সম্পাদিত), এই দেশ এই ঢাকা: থিবক বক্তা, বাণী নিউজ, ও সাক্ষাৎকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা : বঙ্গবন্ধু লিলিটকলা একাডেমি, ২০০৮।

মওনুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল, ঢাকা ১৯৯৪।

শাহরিয়ার কবির, শেখ মুজিব ও মুক্তিযুক্ত, ঢাকা, সময় প্রকাশন ১৯৯৭।

মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু কোষ, ঢাকা ২০১২।

Android Coding Bd